কুষ্টিয়ায় ভেজাল মসলা ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখায় লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার বড়বাজারে ভেজাল মসলা প্রস্তুত ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য সংরক্ষণের অভিযোগে একটি প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বড়বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মসলার পাইকারি ও খুচরা বাজারে ব্যাপক মনিটরিং করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী।

তিনি বলেন, শহরের বড়বাজার এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মসলার স্টক রেজিস্টার, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার এবং পণ্যের মূল্য তালিকা যাচাই করা হয়। এ সময় বাজারে মসলা সংরক্ষণ, মান ও বিক্রয় পদ্ধতিও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

অভিযান চলাকালে বড়বাজারের মেসার্স ঢাকা ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠানে ভেজাল জিরা মসলা প্রস্তুত ও বিক্রি, নিম্নমানের জিরাকে ভারতীয় ব্র্যান্ডের জিরা হিসেবে বিক্রির উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ এবং ১৮০ কেজি মেয়াদোত্তীর্ণ কিসমিস বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুত রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার অর্থ আদায় করা হয়।

এ সময় প্রতিষ্ঠানটির মালিকের কাছ থেকে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম না করার মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামাও গ্রহণ করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, বাজারে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যপণ্য প্রতিরোধ এবং ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের তদারকি অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে। পাশাপাশি

ব্যবসায়ীদের আইন মেনে পণ্য বিক্রি ও সংরক্ষণের জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলীর নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়। অভিযানে জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আরাফাত রহমান ও জেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক সহায়তা করেন।

অভিযানের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা পুলিশের একটি চৌকস টিম এবং র্যাব কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি টহল দল উপস্থিত ছিল।

মাছ শুধু পাতে নয়, উঠে আসে সাহিত্যে, কবিতায়, উপকথায়

নদীর দেশ, জল-জঙ্গলের কোল ঘেঁষা এক সবুজ ভূখণ্ড তারই নাম বাংলা। আর এই বাংলার হৃদয়জুড়ে যে দুটি শব্দ যুগ যুগ ধরে স্পন্দিত হয়েছে, তা হলো মাছ ও ভাত। “মাছে ভাতে বাঙালি” শুধু একটি প্রবাদ নয়; এটি এক কালের স্বাদ, মাটির গন্ধ, মায়ের হাতের রান্না, আর চিরন্তন বাঙালিয়ানার প্রতিচ্ছবি। বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ-“মাছে ভাতে বাঙালি”। এই প্রবাদটি যেন বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক সহজ অথচ গভীর প্রতিচ্ছবি। বাঙালির কাছে মাছ ও ভাত শুধু খাদ্য নয়, বরং তা এক আবেগ, এক ঐতিহ্য, এক জীবনের দর্শন। একসময় ছিল নদী, খাল, বিল, পুকুরে পরিপূর্ণ।

সেখানে মাছের প্রাচুর্য ছিল স্বাভাবিক বিষয়। ফলে ঐতিহ্যগতভাবেই মাছ হয়ে উঠেছে বাংলার মানুষের প্রিয় খাদ্য। অন্যদিকে ধানচাষ প্রধান অর্থনীতি হওয়ায় ভাত বাঙালির প্রধান আহার। এই দুইয়ের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে এক অনন্য খাদ্যসংস্কৃতি, যা অন্য কোনো অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এতটা গভীরভাবে দেখা যায় না।

এই মাটি ভিজে থাকে শ্রাবণের জলে, আর নদীর বুকে খেলে বেড়ায় রূপালি ইলিশ। ঢেঁকিতে ভাঙা চালের গন্ধে মিশে যায় মেঘলা আকাশের আহ্বান।

গৃহিণীর কড়াইতে যখন সরষে ফোঁড়ন পড়ে, তখন মনে হয় এ এক অলৌকিক সঙ্গীত। শিশুর প্রথম দুধভাত থেকে বৃদ্ধের শেষ আহার- সবকিছুতেই থাকে ভাত আর মাছের ছোঁয়া।

বাংলার পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এই নদীগুলি শুধু জল নয়, প্রাণ। তারা বয়ে আনে মাছের ভাণ্ডার, বাঙালির জীবনের চিরন্তন উপহার। কখনও তা ইলিশের রাজারি, কখনও রুই-কাতলার রাজনীতি। কখনও ঝোলে ডোবা পুঁটি, কখনও ভাজা চিংড়ির সুবাস। ইলিশ, রুই, কাতলা, পুঁটি, শোল, পাবদা, ট্যাংরা, এমন কত রকমের মাছ যে বাঙালির রসনাকে মোহিত করেছে! ইলিশের সরষে বাটা, রুই মাছের কষা, ট্যাংরার ঝোল, পাবদা মাছের দই-পোস্ত বা চচ্চড়ি, এসব শুধু পদের নাম নয়, প্রতিটিই একটি করে আবেগ, একেকটি পরিবারের স্মৃতি, ভালোবাসার মুহূর্ত। প্রতিটি রন্ধনে মিশে থাকে ভালবাসা, স্মৃতি আর ইতিহাস।

মাছ শুধু পাতে নয়, উঠে আসে সাহিত্যে, কবিতায়, উপকথায়। রবীন্দ্রনাথের “মাছের ঝোল” আর বিভূতিভূষণের গ্রামীণ গল্পে ভাতের সঙ্গে টাটকা শোল মাছ যেন জীবনের প্রতিচ্ছবি। কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় মাছ ও ভাতের প্রসঙ্গ এসেছে বহুবার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আজকের লেখকরাও বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতির কথা তুলে ধরেছেন।

গ্রামবাংলার সন্ধ্যায় পুকুরঘাটে জাল টেনে ওঠে শুধু মাছ নয়, ওঠে পারিবারিক গল্প, ভালবাসা আর গ্রামীণ জীবনের নিঃশব্দ ছন্দ। তবে “মাছে ভাতে বাঙালি” শুধু খাদ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির সংস্কৃতি, সামাজিকতা ও সাহিত্য। বাঙালির বিয়ে-শাদিতে, উৎসব-অনুষ্ঠানে মাছের উপস্থিতি যেন বাধ্যতামূলক। নববধূর বাড়িতে মাছ পাঠানো, অতিথি আপ্যায়নে মাছের কদর, এমনকি পূজার ভোগেও মাছের উল্লেখ, এসবই এই সংস্কৃতির অংশ।

উৎসব-অনুষ্ঠান মানেই বাঙালির রান্নাঘরে মাছের উল্লাস। বিয়ের পদে বড় রুই মাছ যেন নবদম্পতির সুসম্পর্কের প্রতীক। পয়লা বৈশাখে ইলিশ ভাত যেন নতুন বছরের প্রতিশ্রুতি। এমনকি “মাছে-ভাতে মেয়ে” বলেই প্রশংসা করা হয় সহজ সরল, গৃহস্থালি জীবন ভালোবাসা মেয়ের।

বিদেশ বিভুঁইয়ে থাকা বাঙালিও স্বপ্ন দেখে- এক প্লেট গরম ভাত, তার পাশে ঝালঝোল মাছের গন্ধ। যেন বিদেশের ধোঁয়াটে ব্যস্ত জীবনে একটু ‘বাংলা’র স্পর্শ।

আজকের জগত বদলেছে। চিপস, পিজ্জা, বার্গার এসেছে বাজারে। কিন্তু

বাঙালির আত্মা আজও খুঁজে ফেরে সেই কাঁশবনের পাশে মাটির বাড়ি, ধানখেতের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী, আর দুপুরবেলার সেই গরম ভাতের ধোঁয়া।

যদিও আধুনিক জীবনযাত্রা ও নগরায়ণের ফলে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, তবুও মনের গভীরে মাছ-ভাতের প্রতি টান আজও অমলিন। প্রবাসে থাকা বাঙালিরাও মাছে ভাতে ফিরে যেতে চায়, খোঁজে একটুকরো ‘বাংলা’র স্বাদ।

সবশেষে বলা যায়, “মাছে ভাতে বাঙালি” শুধু একটি প্রবাদ নয়, এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি, ও ভালোবাসার প্রতীক। যতই সময় এগিয়ে যাক, মাছ আর ভাত থাকবে চিরকাল বাঙালির হৃদয়ে, রসনায় ও ইতিহাসে। কারণ “মাছে ভাতে বাঙালি” এই একটি বাক্য যেন এক কবিতা, এক ছবি, এক জীবন। এতে আছে বাংলার আবহমান সংস্কৃতি, স্মৃতি, সুগন্ধ আর হৃদয়ছোঁয়া সহজতা। যতদিন বাংলা থাকবে, ততদিন বাঙালি তার ভাত-মাছকে ভালোবেসে যাবে- মা যেমন তার সন্তানের মুখে প্রথম গ্রাস তুলে দেন, তেমনি। এ এক প্রেম, যা কেবল পেটে নয়, প্রাণে বাজে।

চব্বিশের তুলি

চব্বিশ দেখেছে তুলি
চেনেছে কেমন গুলি,
বিঁধেছে ডান পায়!
মা বলল আন্দোলন
বাবা বলেছে দমাতে
ছুড়েছে বারান্দায়।

খেলছিল তুলি খেলা
পড়ন্ত – বিকেল বেলা
কোলে নিয়ে পুতুল,
কোত্থেকে গুলি এসে
রক্তে – দিয়েছে ভেসে কাণ্ড কী – হুলুস্থুল!

শরতের শুভ্রতা

ভাদ্র-আশ্বিন শরৎকাল প্রকৃতিতে আসে,
শুভ্র সাদায় নদীর দু’কুল কাশ ছোঁয়ায় হাসে।

শরতের সেই আকাশ জুড়েই
সাদা মেঘের ভেলা,
তারই মাঝেই দিনভর চলে রোদ বৃষ্টি খেলা।

পায়ের তলায় যে দূর্বাদলে
হাসে মুক্তোকণা,
ধরায় আসলে শুভ্র শরৎ
মনটা আনমনা।

এঁকেছি চোখে

জবা ফুল তুমি রোজ লাল হয়ে ফোটো কুমড়োলতা তুমি কারে বেয়ে উঁচু ওঠো? শিমুলের কী সুবাস অথচ বিনয়ে ঝুঁকে শাপলা পদ্মের বোন বলে গরিমা বুকে।

শালিকপাখি গোনা জানে গণকেরা যথা? চড়ুইয়ের উড়ুউড়ু বুকে নিরব কত কথা বাবুইয়ের ঠোঁটে ঠোঁটে সবুজ বসতি গাঁথা কোয়েলের মনে আহা কে দিলো ব্যথা?

এই যে এঁকেছি চোখে পরিপাটি এক ছবি ফুল, পাখি,নদী,শিশুখেলা সবার দাবি

আরও রাখা যেত জানি চাঁদ,তারা, রবি
তবু তোমরা দেখবে না জানে সবই কবি।

প্রকৃতির রূপ-রস যত সুন্দর মনের মতো কে তারে চেয়ে দেখে ভরিতে উদর যতো,
জীবন সার্কাসের মঞ্চে নাচায় বাঁদর কতো প্রকৃতি তো দূর,ভুলি নিজেকেই অবিরত।

লতাপাতা

লতাপাতা একসাথে গাঁথা-একসাথে বসবাস,
নদীতট একসাথে থেকেও-যেন তারা পরবাস।

লতার সুখে পাতার সুখ, এক সাথে বাঁচে প্রাণ, নদীর দুঃখে, তটের দুঃখ, জীবনের অবসান।

আলো আঁধার দু’জনাতে, একসাথে থাকে মিশে-রাত আর দিন পাশাপাশি, কেমনে থাকে বসে।

লতারে পেঁচিয়ে পাতা, জড়িয়ে থাকে বুকে ধরে, একই অঙ্গে কত রূপ তার, থাকে চুপটি করে।

আবার লতা পাতায় কত যে, ঔষধি গুনের দেখা, সবুজে সবুজে ভরে প্রাণ-সতেজ জীবন আঁকা।

কখনো কখনো লতাপাতায়-সবজির থাকে গুণ, অবয়ব জুড়ে উজ্জলতা আনে, থামায় পেটের আগুন।

মরুচরে গাদাগাদি করে-হয় নাকো বসবাস, লতাপাতা ঘেরা আঙ্গিনার মাঝে সচল নিঃশ্বাস।

এক ডগা হতে আরেক ডগা, লাগে না পারাপারে, দেখে চোখ জুড়ায়, ঝাপসা কাটে, ঘন অন্ধকারে।

নাম শুনলে ভালো লাগে-দেখতেও কতই না ভালো, আগাছা ভেবে উপরে ফেলোনা-জীবন হবে কালো।।

দামুড়হুদায় জাতীয় কবি কাজী নজরুলের ৪৮ তম প্রয়াণ দিবস পালন

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাডাঙ্গায় ২৭ শে আগষ্ট মঙ্গলবার (১২ ই ভাদ্র বাংলা) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৮ তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে স্মৃতি বিজড়িত আটচালা ঘর চত্বরে কবীর স্মৃতি স্তম্ভে সকাল সাড়ে ১০ টায় পুষ্প মাল্য অর্পণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। আটচালা ঘর মালিক প্রকৃতি বিশ্বাস বকুল,মধু বিশ্বাস, আপেল হোসেন, উসমান গনি প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন মাও: নুরুল আমিন।

নজরুল স্মৃতি বিজরিত আটচালা ঘর মালিক প্রকৃতি বিশ্বাস বকুল তিনি কবি নজরুল ইসলামের কার্পাসডাঙ্গায় আগমনের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তরুণ বয়সে অনেকবার এসেছেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী জনপদ কার্পাসডাঙ্গায়। তার স্মৃতিবিজড়িত খড়ের আটচালা ঘরটি এখনো সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ঘরটি বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। কবি যে এ ঘরেই অনেক দিন-রজনি কাটিয়েছেন, সে ব্যাপারে কারও দ্বিমত বা বিতর্ক নেই। তৎকালীন দামুড়হুদা উপজেলার ভৈরব নদের তীরবর্তী কার্পাসডাঙ্গা মিশনপাড়ার সরকার পরিবার ছিল জ্ঞান-গরিমায় বেশ সম্ভ্রান্ত। এ পরিবারের সন্তান শ্রী মহিম সরকার চাকরির সুবাদে থাকতেন কলকাতায়। কলকতা আমহার্স্ট স্ট্রিটে তিনি সপরিবারে বসবাস করতেন। মহিম সরকারের সঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলামের খুবই সখ্য ছিল। তার বাড়িতে কবির আসা-যাওয়া ছিল আপনজনের মতো। তার দুই মেয়ে আভা রানি সরকার ও শিউলী রানি সরকার নজরুলগীতি চর্চা করতেন। তাদের গানের তালিম দিতেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজে। পরবর্তীতে আভা রানি সরকারের গানের রেকর্ডও বের হয়। প্রখ্যাত লেখক ড. আশরাফ সিদ্দিকী অনুসন্ধান করে নজরুলের কথা ও সুরে আভা রানি সরকারের ছয়টি গানের রেকর্ড-তথ্য পান।

একাধিক তথ্যসূত্রে জানা যায়, মহিম সরকারের পারিবারিক আমন্ত্রণে একাধিকবার কবি নজরুল কার্পাসডাঙ্গায় এসেছেন। তবে ১৯২৬ সালে ২৭ বছর বয়সে কবি সপরিবারে এখানে বেড়াতে আসেন। এ সময় প্রায় দুই মাস কার্পাসডাঙ্গায় অবস্থান করেন। তার সঙ্গে এসেছিলেন শাশুড়ি গিরিবালা, স্ত্রী প্রমীলা ও বড় ছেলে বুলবুল। তারা কলকাতা থেকে ট্রেনযোগে দর্শনায় নেমে ছয় মাইল পথ পাড়ি দিয়ে গরুর গাড়িতে করে কার্পাসডাঙ্গায় আসেন।

সুন্দর বাংলাদেশ

হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান
গাই বিজয়ের গান,
দেশের প্রতি আছে সবারই
ভালোবাসার টান।
বৈষম্য আর ভেদাভেদ ভুলে,
একই পতাকাতলে,
অধিকার আদায়ে ন্যায়ের পক্ষে ছুটবো দলেদলে।
আমরা বাঙালি স্বাধীন জাতি ধর্ম বর্ণ ভুলে,
শির উঁচিয়ে চলবো সদা পতাকা হাতে তুলে।
আমরাই ভাঙবো কালোবাজারি দুর্নীতির কালো হাত, তবেই দেশে বিরাজ করবে শান্তি দিবা-রাত।
স্বৈরাচারী জালেম শাসক করে দেবো নিঃশেষ,
মিলেমিশে গড়বো একটি সুন্দর বাংলাদেশ।

অন্তিম যাত্রার আয়োজন

আমাবস্যার ঘোর অমানিশায় বিনিদ্র নিম রজনীর নিঃসীম ঘণ,গাঢ় আঁধারে খুঁজেছি
হারিয়ে যাওয়া,দূ-স্নৃতির আড়ালে তলিয়ে যাওয়া তোমায় দৃষ্টির নিভূ নিভূ প্রদীপ জ্বেলে।
পাইনি কোথাও তোমায়,পাইনি তোমার ছায়াকে,
পাইনি আমার আলেয়ার আলোকেও।
নিঃসঙ্গ,অসহায়,একলা আমি হাঁতড়ে বেড়িয়েছি জীবনের ডায়েরী থেকে হারিয়ে যাওয়া ধূসর,
মুছে যাওয়া কত স্নৃতির!
পারিনি ব্যর্থ আমি! পারিনি,আমাতে জড়িয়ে থাকা তোমাকে আমা হতে ভিন্ন,আলাদা করতে!পারিনি,দু’হাতে সরিয়ে দিতে আমার চারপাশে অক্টোপাশের মত আষ্টে-পিষ্টে আঁকড়ে থাকা শত-সহস্র কষ্টের জাল ছিন্ন করতে!
নিরাশার ধূ ধূ বালুচরে ডুবে যেতে থাকা আশা-আকাঙ্খারাও ভয় পায় এখন আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে।
সারথিহীন স্বপ্নরা এখন আর ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়ায় না ঐ অসীম গগণতলে।
এই নশ্বর ধরিত্রী এখন আর আমাকে চায় না ঠিক তোমার মত। নিরবিচ্ছিন্ন একাকীত্ব এখন আমার অন্তিমশয্যার পুষ্পসজ্জা। নিদারুণ মর্মভেদী অসহায়ত্ব ওপারে যাবার ভেলা।

অতএব, একাকীত্ব ও অসাহয়ত্বকে সঙ্গী করেই তবে আরম্ভ হোক আমার তিরোধানের,অন্তিম যাত্রার!!!

আমি কি মা?

কে ঝরালো বুকের রক্ত
আমার মানিক সোনার?

এতটা বড়ো শাস্তি কেন কতটা স্বপ্ন বোনার?

স্বাধীন দেশে রক্তে কেন ভেজানো লাগল ভূমি?
পুত্রকে বলতে না দেয়া ‘মা যে আমার তুমি?’

এই কোল করাতে খালি
জরুরি ছিল কী গুলির? শেখাবে কি আমার দেশ
কী মানে সব বুলির?

কী-রকমের মা – হয়েছি কাঁদতে পারছি না কেন? চব্বিশের এ উপত্যকায় কীসের আমি কেন?